ধর্মের ধরণ । ছবি : রাজেশ রক্ষিত

পশ্চাতে রেখেছি যারে

শ্রীগঙ্গাধর কর

(অধ্যাপক, দর্শনবিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

সুনীল জলধির উত্তরভাগে এবং হিমাদ্রির দক্ষিণভাগে অবস্থিত সুবিশাল ভূমিখণ্ড হল ভারতবর্ষ। বিশ্বের সবচেয়ে প্রচীন সভ্যতা গুলির একটির উৎপত্তি ঘটেছিল এখানে, এই দেশে। প্রাক্ আর্য্যসভ্যতার যুগে সমগ্র ভারত ভূমি জুড়ে যারা বাস করত, তাদের আমরা 'আদিবাসী' নামে অভিহিত করে থাকি। 'আদিবাসী' শব্দের সাধারণ অর্থ হল আদি বা প্রথম বাসিন্দা—যারা এক সময় ভারতবর্ষে প্রথম অধিবাসী হিসেবে পরিগণিত হয়েছে ও তাদের উত্তর সুরী। এই সব অধিবাসীদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস, রীতি-নীতি নিয়ে গড়ে উঠেছিল তাদের সংস্কৃতি। অতীতকালের চিন্তাধারার বিভিন্ন স্তরের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে যেমন গড়ে উঠেছে আজকের যুগাদর্শ। তেমনি আগামী দিনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আজকের বর্তমানই অতীতের উপাদানরূপে কাজ করবে। অখন্ড কালের কোলে কোনও কাল যেমন প্রক্ষিপ্ত হতে পারে না, তেমনি কোনও আদর্শ, বিশ্বাস আকস্মিক হতে পারে না। প্রতিটি যুগই তার পূর্ববর্তী যুগচিন্তার দ্বারা প্রভাবিত।

প্রাক্ আর্যসভ্যতার যুগে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে থাকা সেই সব আদিবাসীদের সম্যক্ পরিচয় লিখিত তথ্যের আকারে পাওয়া যায় না। তাই অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নির্ভর করতে হয় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের উপর। এ ছাড়া বর্তমান কালের অনার্য শ্রেণীর লোকেদের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি থেকেও সুপ্রাচীন কালের মোটামুটি একটা চিত্র অনুমান করে নিতে পারা যায়।

অধ্যাপক কার্ল ক্লিয়েন, হার্বার্ট স্পেন্সার, র‍্যাফেল কার্স্টেন, অয়েস্টারমার্ক, ফ্রেজার, টাইলর প্রভৃতি নৃ-বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দেশের আদিম মানুষের জীবনযাত্রা, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতির উপর গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। তা থেকে বোঝা যায়, আদিম মানুষের সামনে প্রধান যে দুটি সমস্যা দেখা দিয়ে ছিল, তা হল রোগ ও মৃত্যু। জীবদেহের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হল আত্মরক্ষা। হিংস্রজন্তুর আক্রমণ হতে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে, রোগের কবল হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আদিম মানুষ নানা উপায় যেমন অবলম্বন করেছে, তেমনি নানা অন্ধবিশ্বাসের জালে জড়িয়ে নানা ক্রিয়াকান্ডের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এভাবে দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে গড়ে উঠেছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ও ধর্মবিশ্বাস।

মানুষের সামনে কাজের কাজ একটাই—বড় হওয়া, বাধাবিঘ্ন সত্বেও নিজেকে বিকশিত করা। বস্তুত একমাত্র মানুষই সচেতনভাবে, সুপরিকল্পিতভাবে নিজেকে বিকশিত করতে সক্ষম। শুধু তাই নয়, এই রূপান্তরের গতি-প্রকৃতিকেও সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে নানা বাধাবিঘ্ন, প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করা চাই। বাঁচার তাগিদে তাই আদিম মানুষের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রতি অধিক ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। আর্যগণের আগমনের ফলে এদেশের প্রকৃত আদিবাসীদের মধ্যে একটি সংঘাত আমরা দেখতে পাই। কিন্তু বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে আর্যগণ সহজেই এগিয়ে যাওয়ায় পিছু হঠতে হয় আদিবাসীদের। তারা তখন জীবন ও জীবিকার সন্ধানে অরণ্যে, পাহাড়-পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এভাবে তারা নিজভূমে পরবাসী হয়ে পড়ে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের মিলন লক্ষ্য করা গেছে, যদিও তা সংখ্যায় নগণ্য। আর্যদের বসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারের প্রেক্ষিতে অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে আদিবাসীদের জীবন চর্যা। অন্যান্যদের সঙ্গে তুলনামূলক জীবনযাত্রায়, স্বাভাবিকভাবে অনেকটা পিছিয়ে থাকায়, অনগ্রসরতার কারণে তারা আড়ষ্টবোধ করতে থাকে। পরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে সংবিধানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে এই সব আদিবাসীদের জীবনে এক স্থিতিশীল অর্থনীতির বুনিয়াদ রচনার প্রয়াস নেওয়া হয়। ১৯৮১ সালের লোকগণনায় দেখা গেছে, ভারতীয় জনসংখ্যায় ৭.৭৬ অংশ আদিবাসী শ্রেণীর অন্তর্গত। গোষ্ঠী হিসেবে এদের সংখ্যা সারা ভারতে প্রায় ৪৫০ এর কাছাকাছি।

জীবনযাত্রার বিচিত্র কর্মকুশলতায় তাদের মধ্যে অনেকে পশু-পাখির শিকার করেই দিন অতিবাহিত করে। অনেকে অবশ্য পশুপালন, স্থানান্তরী কৃষিব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন-যাপনে উৎসুক। যারা স্থান ও কালের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন জীবনের পথে পা বাড়িয়েছে, তাদের অনেকে অবশ্য শ্রমিক, খনি-মজুর কিংবা নানা চাকুরিতে যুক্ত হয়েছে। ফলে ক্রমবিবর্তনের ঢেউ তাদের জীবনে এনেছে বিচিত্র স্পন্দন, এনেছে নতুন মানসিকতার জোয়ার। জীবন সংগ্রামের অস্থিরতায়, কখনও বা বিরুদ্ধ পরিবেশকে প্রতিরোধ করার চেষ্টায় তাদের মধ্যে কখনও কখনও ফুটে উঠেছে গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্য ও রক্ষণশীলতা। ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ বেয়ে উঠতে এই সমাজ কখনও ক্লান্ত বা আড়ষ্ট বোধ করেনি, পরন্তু নবনব দিশার সন্ধান পেয়ে তারা আনন্দমুখর উদ্দমতায় এগিয়ে চলতে রাজী।

আমরা যদি সুদূর অতীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহলে দেখতে পাবো, ভারতের কয়েকটি জায়গায় প্রাচীন প্রস্তর যুগের স্মৃতি সীমাবদ্ধ, এই যুগে ব্যবহৃত বিভিন্ন হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র আরণ্যক জীবনের সংস্কৃতির বাহক। ধীরে ধীরে মসৃন প্রস্তর ফলকের ব্যবহার দেখে উন্নত সভ্যতার ইঙ্গিত মেলে—যা ভূমিসংলগ্ন কৃষকের প্রায্যজীবন, স্থায়ী ঘর-দোর বাঁধার আকূলতায় ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় সদা চঞ্চল। মানুষ তখন কৃপণা পৃথিবীকে নতুনভাবে বোঝার চেষ্টা করেছে ও পরিবেশকে অনুকূল করার চেষ্টায় মেতেছে। এই প্রচেষ্টার ফলে শ্রমবিভাজন, সম্পদ আহরণ ও বন্টনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। পরিবেশের মানচিত্র বদলের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের মন-চিত্রও পরিবর্তিত হয়েছে, এক সংস্কৃতি, অন্য সংস্কৃতির উপর প্রভাববিস্তার করেছে। ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, ভারতবর্ষকে আদিম 'নিগ্রিটো' মানুষ অন্য বলিষ্ঠ গোষ্ঠীর আগমনে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে মূল ভারত ভূখন্ডের বিরাট অংশ ছেড়ে। আদিম অষ্ট্রেলিয় গোষ্ঠীর মানুষ কৃষি কেন্দ্রিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিল, এবং তাদের সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর মানুষের সম্পর্ক ও সংশ্লেষে নতুন সংস্কৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্র সংগঠিত হতে থাকে। পরে যাযাবর গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের নতুন করে অভিযোজন শুরু হয়। এর ফলে রচিত হয় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি।

দুঃখের বিষয় হল, এই বিশাল ভারতবর্ষে ক্রমোন্নতির পথ ধরে অনেক কিছু এগিয়ে চললেও আশানুরূপ এগুতে পারেনি হতভাগ্য এই আদিম গোষ্ঠী; রচিত হয়নি অনাদৃত, অবহেলিত, শোষিত অথচ মৃত্তিকার অগ্রাধিকারী আদিবাসীদের জীবনেতিহাস। এ বিষয়ে ই. টি. ডালটন (E. T. Dalton) সাহেবের ('Descriptive Ethnology of Bengal') প্রকাশের পরে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের এইচ. এইচ. রিজলে সাহেব (The Tribes and Castes of Bengal') নামে আরও একটি গ্রন্থ রচনা

করেন। এই সব গ্রন্থে আদিবাসীদের জীবন ও সমস্যা নিয়ে গভীর তেমন কোন আলোচনা নেই। কারণ, বিদেশী সাহেবদের পক্ষে আদিবাসীদের সমস্যাসংকুল সমাজব্যবস্থার অতলে নেমে সব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। ও ছাড়া এ দেশের সমাজ সংস্কৃতিক জানার জন্য যে পরিমাণ অধ্যবসায়ের প্রয়োজন ছিল, তা সংগত কারণেই সাহেবদের ছিল না। তবুও সাহেবদের কাছে আমাদের নতিস্বীকার করতে হয় এই কারণে যে, সাহেবরা যা করতে পেরেছেন, আমরা ভারতীয়রা তা পারিনি।

কয়েকবছর আগে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা পালন করেছি মহা সমারোহে ঢাকঢোল পিটিয়ে। বিগত পঞ্চাশ বছরে নানা ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতির কথা বিভিন্ন কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছে। কিন্তু সেভাবে তুলে ধরা হয়নি পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের সঠিক চিত্র। স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল, শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে দুঃখ দারিদ্র্যমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত, সম্পদশালী একটি স্বপ্নের দেশ গড়া সেখানে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ন্যূনতম ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু কোথায় কী? আট আটটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কল্পিত হয়েছে, অথচ তার পরেও দেখা যাচ্ছে; এ দেশের মানুষ দু'বেলা পেট পুরে খেতে পায় না। এখনও বিরাট সংখ্যক মানুষ রাস্তাঘাটে, অরণ্যে পশুবাসের অযোগ্য খড়কুটোর কুঁড়েঘরে দিন কাটায়—যাদের কাছে পরিশ্রুত পানীয়জল স্বপ্নের মত, আর হাতুড়ে ডাক্তার, ওঝা, ঝাড়ফুঁক ও দেবদেবীর স্থানে মানত করেই জীবন সঁপে দিতে হয়। মধ্যযুগীয় কুসংস্কার আজও আদিবাসী-সমাজ জীবনকে গ্রাস করে চলেছে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও দেশের যদি এই হাল হয়, তাহলে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর কীভাবে দিন কাটে তাসহজেই অনুমান করা যায়।

আর্যপূর্বভারতের বাসিন্দারাই হল আদিবাসী-একথা আগে বলা হয়েছে। এই বিশাল ভারতভূখন্ডে যুগযুগ ধরে বাস করে আসছে এ বিশাল মানবগোষ্ঠী। আমরা জানি, ভারতে আর্যদের আগমন ও বসতি বিস্তারের ফলে অনার্য আদিম অধিবাসীরা বনে জঙ্গলে পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আর্যগণই নিজেদের বসতির স্বার্থে আদিবাসীদের তাড়িয়ে নিজেরা সেই জায়গা দখল করে। এভাবে বিতাড়িত হওয়ার জন্য দূরত্ববশতঃ আর্যসভ্যতা তাদের গ্রাস করেনি। তাই আজও এই সব জনজাতির মধ্যে আদিম সংস্কৃতির ছাপ কিছুটা হলেও দেখতে পাওয়া যায়।

আদিবাসী সম্পর্কে বিভিন্ন নৃ-বিজ্ঞানীদের অভিমত নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের অভিমত হল, 'আদিবাসী সমাজ হল কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি অথবা এক গোষ্ঠীর পরিবার যাদের নামের সমতা থাকে, সদস্যরা একটি নিদিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং একই রূপ বিবাহভিত্তিক ও পেষাভিত্তিক ধর্মীয় বাধা-নিষেধ মেনে চলে এবং নিজেদের

মধ্যে বাধ্য-বাধকতা, সামঞ্জস্য ও আদান প্রদান করে থাকে।' সংজ্ঞা যাই হোক, আদিবাসীরা সবসময় একই অঞ্চলে বসবাস করে---একথা বলা যায় না। অনেক আদিবাসী আছে---যারা যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করেছে। যাই হোক, আদিবাসীরা প্রাচীন বসবাসকারী হলেও 'আদিবাসী' এই শব্দটি কিন্তু আদৌ প্রাচীন নয়। যতদূর জানা যায়, ঠক্কর বাপা প্রথম এই নামটি ব্যবহার করেন, পরে গান্ধীজী তা গ্রহণ করেন। ইংরেজী 'ট্রাইব' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। অনেকে আবার উপজাতি, খন্ডজাতি, জনজাতি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন আদিবাসী বোঝাতে তবে বামফ্রন্টের আমলে 'উপজাতি' শব্দটির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আদিবাসীরা দেশের মূল সমাজ হওয়ায় ন্যূনার্তক 'উপ' শব্দের যোগ অনেকে জেনে নিতে পারেনি। তবে 'আদিবাসী' কথাটি যৌগিক অর্থ বহন করায় এটি যথাযথ বলে বিবেচিত হয়।

যাই হোক দৈহিক গঠন, মুখাকৃতি প্রভৃতির নিরিখে আদিবাসীদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

(১) ভারতবর্ষে প্রথম আদিম অধিবাসী হিসেবে বিবেচিত হয় নিগ্রোটু (negroito) সম্প্রদায়ের নাম। আফ্রিকার নিগ্রো জাতির সঙ্গে এদের দৈহিক গঠনের মিল লক্ষ্য করে এরূপ নামকরণ হয়েছে। এরা বেঁটে, কালো, মাথায় ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল, ঠোঁট পুরু, দক্ষিণ ভারতের কাদার ইরুলার এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আন্দামানী জারোয়া, ওঁঙ্গি প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে।

(২) প্রোটো-অষ্ট্রেলীয় জাতি (Proto-Australoid) এই সম্পদায়ের লোকেরা মধ্যমাকার, কালো, চ্যাপটা নাক, নাকের গোড়া বসা, মাথায় ঢেউ খেলানো চুল থাকে। ভারতের মধ্যাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে এদের বাস। মধ্য ও পূর্বভারতের ওরাঁও, মুন্ডা, সাঁওতাল, বিরহড়, কোল, ভীল, লোধা, শবর এবং দক্ষিণ ভারতের চেঞ্চু, কুরুম্বা, বাদাসা প্রভৃতি এই সম্প্রাদায়ের অন্তর্গত।

(৩) মঙ্গোলীয় শ্রেণী (Mongoloid) এই সম্প্রদয়ের লোকেরা উচ্চতায় মাঝারি আকৃতির, গায়ের রঙ হলুদ, চ্যাপ্টা মুখমন্ডল, গন্ডদেশ উচ্চ, মাথায় চুল সোজা থাকে। এদের দাড়ি গোঁফ থাকে না। লেপচা, টোটো রাভা, চাকমা, মগ প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। হিমালয়ের পাদদেশে মঙ্গোলীয় শ্রেণীর লোকেরা বাস করে। নেপাল, ভুটানও চীনের জনগণের সঙ্গে এদের গোষ্ঠীগত সাদৃশ্য আছে।

ভাষা অনুযায়ী আদিবাসীরা চারভাগে বিভক্ত—এস্ট্রো-এশিয়া শ্রেণী, দাবিড় ভাষা গোষ্ঠী, তিব্বতী-চীনা ভাষা গোষ্ঠী এবং ইন্দো-আট ভাষা গোষ্ঠী।

আদিবাসীদের আজ আমরা যে অবস্থায় দেখি, সেই অবস্থা কিন্তু একদিন তাদের ছিল না। জমি জায়গা, ধন-সম্পত্তি তাদের যথেষ্ট ছিল। এমনকি দু'একজন

আদিবাসী-রাজা জমিদারের কথা ইতিহাস হতে জানা যায়। খ্রিষ্ট্রীয় চতুর্দশ শতকে মহম্মদ তুঘলকের সেনাপতি সৈয়দ ইব্রাহিম আলি চম্পা দুর্গ আক্রমণ করলে সেখানকার সাঁওতাল রাজা সপরিবারে আত্মহত্যা করেছিলেন। এই তথ্য Et Dalton সাহেবের বিবরণ হতে জানা যায়।

ইংরেজ রাজত্ব শুরু হওয়ার আগে আদিবাসীদের জীবন মোটামুটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। এদের দৈনন্দিন চাহিদা যৎসামান্য হওয়ায় কারুর কাছে হাত পাততে হত না। প্রয়োজন মত এরা বনজ সম্পদ গ্রহণ করে। চাষ-আবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করত। মুদ্রার আদান-প্রদানের থেকে বিনিময় প্রত্যেকেই তারা অধিক গুরুত্ব দিত। লবণ ও সামান্য বস্ত্রখন্ডের জন্য তাদের বাইরের জগতের উপর নির্ভর করতে হত। ইংরেজ শাসক আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকা নিয়ে গবেষণামূলক কাজকর্ম করলেও তাদের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য কোনও প্রকার ভাবনা -চিন্তা করেনি, বরং করের বোঝা তদের উপর চাপিয়েই গেছে। কখনও কখনও জমিদার-মহাজনদের দিয়ে আদিবাসীদের শোষণ করেছে। আদিবাসীরা প্রতিবাদ করলেই তাদের উপর দমন-পীড়ন নীতি প্রযুক্ত হয়েছে। ১৭৭০ ও ১৭৭৯ সালের চুয়াড় বিদ্রোহ, ১৭৮৩ সালে খাসি বিদ্রোহ, ১৮০৯ সালে জাঠ বিদ্রোহ, ১৮১৮ সালে ভীল বিদ্রোহ, ১৮৩১-৩২ সালে কোল বিদ্রোহ, ১৮৩২ সালে ভূমিজ ব্রিদ্রোহ, ১৮৩৯ সালে নাগা বিদ্রোহ, ১৮৪৬ সালে কোন্দ বিদ্রোহ, ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং ১৮৯৬ সালে মুন্ডা বিদ্রোহ সেই অত্যাচারের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করে। এই সব বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ সরকার আদিবাসীদের সম্পর্কে নতুন নীতি গ্রহণ করে তদের বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। এর ফলে যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সুফল হতে আদিবাসীরা বঞ্চিত হয়। তবে লক্ষ্য করার মত বিষয় হল, শাসক ইংরেজ আদিবাসীদের সামাজিক, ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা না করলেও তাদের মানসিক পরিবর্তনের ব্যবস্থা করেছিল। এজন্য আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারীদের অবাধ কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছিল শাসক গোষ্ঠী। 'আমেরিকান ব্যাপটিস্ট্ মিশন' 'মেথডিস্ট মিশনারী সোসাইটি' এবং চার্চ মিশনারী সোসাইটি' এই তিনটি মিশন সাঁওতালদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা চালিয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় এরা স্কুল গড়ে এবং বিভিন্ন শিল্পকর্মে হাতে নাতে শিক্ষা দিয়ে চেতনার প্রসারে যত্নবান হয়েছিল। মেদিনীপুর জেলার ভীমপুর সাঁওতাল ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল গড়ে উঠেছিল।

এছাড়া রোমান ক্যাথলিকমিশন মেদিনীপুর জেলার কেশিয়ারী থানায়, বর্ধমান জেলার কালনা থানায় এবং মালদহ জেলার হবিবপুর ও গাজল থানায় আদিবাসীদের মধ্যে নানা প্রকার সেবামূলক কাজ করেছে। তবে মিশনারীদের প্রভাবে আদিবাসীদের

মধ্যে খ্রিস্টান ও অ-খ্রিস্টান—এভাবে বিভেদ প্রাচীর গড়ে ওঠায় তাদের সমাজ-সংস্কৃতি ও মনোবল অনেকখানি কমে গেছে। স্বাধীনতালাভের পর আদিবাসী সমাজকে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের সমকক্ষ করে তোলার সংবিধানে বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৮ সলে জওহরলাল নেহেরু আদিবাসীদের উন্নতি বিষয়ে পাঁচটি নীতির কথা বলেন—যা 'আদিবাসী পঞ্চশীল' নামে পরিচিতি। এগুলি হল (১) আদিবাসীদের উন্নতি তাদের নিজেদের সৃজনশীল মনোভাব জাগিয়ে করতে হবে, বাইর থেকে কিছু চাপানো যাবে না। (২) বন-জঙ্গল ও জমির উপর আদিবাসীদের স্বত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে। (৩) প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তাদের মধ্য থেকেই যোগ্য লোক তৈরী করতে হবে। (৪) আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল গুলিতে অতিরিক্ত প্রশাসনের বোমা চাপিয়ে ভারাক্রান্ত করা যাবে না। (৫) আদিবাসীদের উন্নতির মাপকাঠি কেবল পরিসংখ্যান বা টাকা পয়সা ব্যয়ের পরিমাণ দিয়ে বিচার করা যাবে না, গুণগত চারিত্রিক স্ফুরণই হবে উন্নয়নের মাপকাঠি। কিন্তু স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরে দেখা যায় 'আদিবাসী পঞ্চশীল নীতি' ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে আছে, অথচ আদিবাসীদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে অনেক কথা বলা হচ্ছে। তবে একথা সত্য, আদিবাসী উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু সে টাকা শুধু আড়ম্বর আর প্রশাসনেই ব্যয় হয়েছে, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দু'চারজন আদিবাসী হয়তো লেখাপড়া শিখেছেন, কিংবা চাকরি পেয়ে শহরতলিতে সাধারণ মধ্যবিত্তের মত জীবন ধারণের সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু আদিবাসী সমাজের বৃহত্তর অংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে পড়ে আছে। অনাহার, অর্ধাহার আজও তাদের নিত্যসঙ্গী। পেটের জ্বালা মেটাতে গিয়ে বনজ ফলমূলক, পাতা, জীবজন্তু, এমনকি নিকৃষ্ট ধরণের খাদ্য খেয়ে তাদের দিনাতিপাত করতে হয়। বাঁচার নূন্যতম উপাদান তাদের আজও জোটে না। স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও স্বাধীনতার স্বাদ হতে তারা চিরবঞ্চিত।

আমরা জানি, আদিবাসী মাত্রই প্রকৃতির কোলে, অরণ্যের কোলে বড় হয়, অরণ্যই তাদের জীবন ও জীবিকার প্রথম ও প্রধান অবলম্বন, অরণ্যই তাদের দেবতা। অরণ্যের সঙ্গে তাদের জীবন একসূত্রে প্রথিত হওয়ায় অরণ্যকে বাদ দিয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্ব ভাবতে পারে না। তাই তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে—অরণ্যসম্পদের উপর তাদের অধিকার জন্মগত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে তাদের এই অধিকার হতে বঞ্চিত করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। ইংরেজ শাসকবর্গ ১৮৬৪ সালের সরকারী অরণ্য আইনের সাহায্যে অরণ্য অঞ্চলগুলিতে কর্তৃত্ব বিস্তার করতে শুরু করে। আবার স্বাধীনতার পরে দেখা যাচ্ছে—অরণ্যসম্পদ সংগ্রহে সরকার যথেষ্ট তৎপর। কারণ এটি সরকারী আয়ের অন্যতম পথ। এই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারগুলি বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে অরণ্য অঞ্চল ইজারা দিচ্ছে। এই সব

প্রতিষ্ঠান আবার ঠিকাদার নিযুক্ত করছে। এভাবে ঠিকাদাররাই ইচ্ছামত অরণ্যে প্রবেশ করে বনজ দ্রব্যের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে অবৈধ উপায়ে। কখনও বা তারা পুলিশ ও বনকর্মীদের উৎকোচ দিয়ে বনের সম্পূর্ণ অধিকার নিয়ে বনজ সম্পদ ধ্বংস করছে। এই ঠিকাদাররাই আদিবাসীদের সীমাহীন শোষণের মূলে।

আদিবাসীরাই অরণ্যকে সঠিকভাবে চেনে, বোঝে ও ভালোবাসে। অথচ আদিবাসীদের বাদ দিয়েই অরণ্য আইন তৈরী হয়। এই আইনের বলে বনবিভাগ আদিবাসীদের যে কোন জমিকে অরণ্য অঞ্চল ঘোষণা করে দখল নিতে পারে। বেশ কিছু জায়গায় এমন ঘটনা ঘটেছে—যা মর্মন্তুদ। মর্মন্তুদ এই কারণে যে, আদিবাসীদের দেবতাস্থান 'জাহেরথান' পর্যন্ত জোর করে দখল করা হচ্ছে। হিন্দুরা মন্দিরকে, মুসলমনেরা মসজিদকে, খ্রিস্টানরা গীর্জাকে যে চোখে দেখে, সাঁওতালরাও 'জাহেরথান'কে সেই চোখেই দেখে। এভাবেই আদিবাসীদের দেবালয়গুলি অন্যদের দখলে চলে যচ্ছে। অন্যধর্মের ধর্মস্থানে আঘাত হানলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, কিন্তু অবোধ আদিবাসীদের সেরূপ সাংগঠনিক শক্তি না থাকায় চোখ বুজে সব কিছু নীরবে সহ্য করতে হয়। এভাবে আদিবাসীদের ধর্মে আঘাত হানতে গণতন্ত্র সরকারের বিন্দুমাত্র দ্বিধা সংকোচ হয় না। শুধু ধর্মস্থান নয়, আদিবাসীদের সমাধি ক্ষেত্রগুলিও সরকার দখল করে নিচ্ছে। এসব নিয়ে আদিবাসীরা যখনই অন্দোলন করতে গেছে, তখনই দেশের সরকার কড়া হাতে তা দমন করছে। যাইহোক, আজ অরণ্য ভূমিতে অরণ্যপুত্র আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকা ভীষণভাবে বিপর্যস্ত।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকার কোথাও কোথাও গৃহ নির্মাণ করছে ঠিকই , কিন্তু অনেকক্ষেত্রে দেখা যাছে, সেগুলি তাদের ব্যবহার যোগ্য নয়। কারণ সরকার নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ার ও অফিসারদের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়ী তৈরী করছে, অথচ আদিবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ—এমন কোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করছে না। বড় বড় জানালা-যুক্ত বাড়ী সরকার বানাচ্ছে আদিবাসীদের জন্য—যাতে প্রচুর আলো হাওয়া ঢুকতে পারে। অথচ আদিবাসীদের সংস্কৃতি উল্টো কথা বলে। এরা শোবার ঘর ও ঠাকুরের স্থানকে অন্ধকারে রাখার পক্ষপাতী। ফলে তারা সরকারীগৃহ পেয়েও ঘরের বাইরে বারান্দায় একটি কোন ঘিরে নিয়ে অন্ধকার করে সেখনেই গৃহদেবতাকে রাখছে ও শোয়ার ব্যবস্থা করছে, অথচ কক্ষগুলো ফাঁকাই থাকছে। কিংবা লাঙ্গল, কোদল, ঝুড়ি প্রভৃতি জিনিষপত্র থাকছে। আদিবাসীদের সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মসম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা না নিয়ে কাজ করায় বহু সরকারী পরিকল্পনা এভাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। পরিকল্পনার কথা বাদই দিলাম। যাদের যুগ যুগ ধরে অন্ধকারে রাখা হয়েছে, সহসা তাদের হাত ধরে আলোয় টেনে আনা যায় না, আস্তে আস্তে আনতে হয়। তাছাড়া অবহেলিত সমাজকে নিয়ে কারই

বা এত মাথাব্যথা। এভাবে অনাদিকাল হতে আদিবাসী সমাজ শিক্ষা, সংস্কৃতি ভাষা, জমি, বাসস্থান ইত্যাদি নানা সমস্যায় জর্জরিত—যার আশু সমাধান অদূর ভবিষ্যতে হবে, এমনটি ভাবা যাচ্ছে না।

প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে, কিন্তু আদিবাসীদের ক্ষেত্রে সে অধিকার কোথায়? অথচ এই অধিকার হল মৌলিক অধিকার, শাশ্বত মানবিক অধিকার। ব্যক্তি বিশেষের যেমন অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজ অধিকার বুঝে নেওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে, তেমনি একটি জাতিরও সেই অধিকার আছে। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজদের শোষণ উৎপীড়ন থেকে মুক্ত হতে চেয়ে আদিবাসীরা দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা, সংগ্রামে যোগদান করে দেশকে মুক্ত করেছে, কিন্তু সমাজ তথা উচ্চবর্ণের শোষণ উৎপীড়ন হতে নিজেদের মুক্ত করতে পারেনি। আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রেণের অধিকার উপেক্ষিত হয়েছে বার বার স্বাধীন ভারতবর্ষে। আর্যসভ্যতায় তথা কথিত সভ্য আমরাই তাদের পিছনে ফেলে রেখেছি নিজেদের কায়েমী স্বার্থে। কোনও রাজনৈতিক দল আদিবাসী সম্প্রদায়ের উত্থানের পথ প্রশস্ত করেনি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই সমস্যাকে জ্ঞাতসারে সযত্নে এড়িয়ে গেছে একাধিকবার। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন-এর কাছে যোশী-ডাঙ্গে-অধিকারী রণদিভে পরিচালিত কমিউনিস্ট পাটি যে স্মারকলিপি পেশ করেছিল, ততে মাত্র ১৮টি জাতির বাসভূমির কথা উল্লেখ করা হযেছিল। আবার ১৯৫৪ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির কাছে কমিউিনিস্ট পার্টি মাত্র ২০টি রাজ্য গঠনের দাবি জানিয়েছিল। নাগা, মিজো প্রভৃতি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সেদিন উপেক্ষা করা হয়েছিল। পরে অবশ্য নাগা ও মিজোরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায় করে নেয় সংগ্রামের মাধ্যমে।

অদিবাসী সমাজ অনুগ্রহ চায় না। চায় ন্যায় বিচার, চায় আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার, আর চায় রুজি-রোজগার ও বাসস্থানের মানবিক অধিকার। আদিবাসী সত্তা হতে জাতীয় সত্তায় বিকশিত হওয়ার সাংবিধানিক অধিকার—যা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অসম্ভব, কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার আর বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন যতদিন থাকবে, ততদিন জাতিতে জাতিতে শত্রুতা, শোষণ-উৎপীড়ন বৃদ্ধি পাবে, এবং শোষক জাতির বিরুদ্ধে শোষিত উৎপীড়িত জাতির মুক্তিসংগ্রাম তীব্রতর হবে। নিঃস্ব সর্বহারা মানুষের মত আদিবাসীরাও আজ বুঝতে পেরেছে, রাষ্ট্র ব্যবস্থা যতদিন না কৃষক, মজুর সাধারণ মধ্যবিত্ত ও প্রগতিশীল, বুদ্ধিজীবিদের সহায় হচ্ছে, ততদিন পিছিয়ে পড়া মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সুদূর পরাহত। তাই আজ ভারতবর্ষে অনেক জায়গায় ছোট বড় নানা আকারে আদিবাসী জাগরণ দেখা দিচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আদিবাসী মানসিকতার সঙ্গে অন্যান্য সমাজের সমন্বয় আজও ঘটেনি।

আদিবাসীদের মানসিকতাকে ঠিকমত বুঝতে না পারার কারণে তাদের সঙ্গে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের একটা বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে। ওদের জীবন সংস্কৃতি ভারতীয় সমাজের কাছে আজও অপরিচিত। মানসিক সংহতির অভাবই পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস ও ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সুযোগ নিয়ে বিচ্ছিন্নকামী শক্তিগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদের রাজনীতি খেলছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দলের প্রয়োজনে আদিবাসীদের নানাভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছেন। কিন্তু ভুললে চলবে না, আমরা সবাই এক অখণ্ড ভারতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাসের উত্তরাধিকারী এবং এটিই আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয়।

পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিয়ে মহাত্মাগান্ধী বিশেষভবে চিন্তিত ছিলেন এবং সেই সব মানুষদের উন্নতির জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর সারাটি জীবন জুড়ে আদিবাসীদের স্বার্থে নানা প্রস্তাব ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সংবিধানে আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন বিভিন্ন অনুচ্ছেদে। কিন্তু দেখা গেছে, এই সব পরিকল্পনা যতটা রূপায়িত হওয়া উচিত ছিল, বাস্তবে ততটা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ হতে শুরু করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বহু গুণী ব্যক্তি বার বার তাঁদের রচনায় দলিত আদিবাসীদের স্বার্থে পরিকল্পনা গ্রহণের কথা বলেছেন, তাদের পিছনে না ফেলে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য উচ্চবর্ণের প্রতি হুঁসিয়ারী দিয়েছেন—

'যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছে যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে/আড়ালে ঢাকিছ যারে/
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

কিন্তু তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ কবির নির্দেশকে এক কান দিয়ে শুনে অপর কান দিয়ে বার করে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। ভারত পথিক স্বামী বিবেকানন্দ পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কী বলেছেন— তা এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক—

'জনগণকে অবহেলা করাই ভারতের জাতীয় পাপ এবং অবনতির প্রধানতম কারণ। নিম্নজাতিরা উচ্চবর্ণের শিক্ষার জন্য পয়সা দিয়েছে ধর্মলাভের জন্য মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছে। কিন্তু তার বিনিময়ে তারা চিরদিন লাথিই খেয়েছে।...সমাজ সংস্কারকরা খুঁজে পান না ক্ষতটা কোথায়? তাঁরা জানেন না, জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর।'

বস্তুতঃ স্বামীজি বুঝেছিলেন, ঊনবিংশশতাব্দীর সংস্কার অন্দোলনগুলির পিছনে যতই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অবদান থাক, তার সুফল লাভ করেছে সমাজের ধনী,

অভিজাত, বড়জোর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু সমাজের অবহেলিত অতিদরিদ্র পর্ণকুটিরের সাধারণ মানুষের কাছে সেই সংস্কার আন্দোলনের সুফল পৌঁছায়নি। তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের সমস্যার সঙ্গে সেই সংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধ নয়। তাই তারা যে অন্ধকূপে পড়ে আছে, সেখানেই পড়ে রয়েছে—যেখানে সংস্কারের আলো পৌঁছায়নি। স্বামীজি বিস্ময়করভাবে রবীন্দ্রনাথের মতই সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর দরিদ্রতম মানুষদের সমস্যার মূলে যে আত্মশক্তির অভাব রয়েছে, সেকথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—'সমস্ত ত্রুটির মূল এখানে যে, সত্যিকারে জাতি—যাহারা কুটিরে বাস করে তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, ক্রিস্টান প্রত্যেকের পদতলে পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ধনীর পদতলে পিষ্ট হইবার জন্যই তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদের শিক্ষিত করিতে হইবে।'

উপসংহারে একটি কথাই বলতে চাই, তা হল ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সর্বভূতে অমিই আছি, চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে এই সত্যের অনুশীলনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।' মানবের একত্ব মহামানবতা বলে যদি কোন বস্তু থাকে, তবে তা ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্যেই আছে। ভারতের ঋষিগণ সাধনবলে এই মহাসত্য উপলব্ধি করেছিলেন, একত্বের মন্ত্র লাভ করেছিলেন। তাঁরা বহু বিভক্ত জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করে প্রচার করেছিলেন—এখানে বহু নেই, নানাত্ব নেই 'নেই নানাস্তি কিঞ্চন'। অথচ আমরা নিজেরা উচ্চ-নীচ, ভেদাভেদ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ইত্যাদি কত ভাবে সমাজকে ভিন্ন ভিন্ন করে দেখি-তার ইয়ত্তা নেই। অপরকে নানাভাবে অবদমিত করে নিজেদের মহান করে তুলি। অথচ আমরাই আবার ঐক্যের কথা বলি—এর চেয়ে শঠতা আর কীই বা হতে পারে।

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

ঋক্ ১০/১৯১